সাদাসিধে কথা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

যশোরের ভবদহের গল্প

টুকু গাল ফুলিয়ে বলল, 'আমি ঢ্যাপ খাব না। আমি ভাত খাব।' মা টুকুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আজ খেয়ে নে বাবা। কাল তোকে ভাত দেব।'

টুকু বলল, 'আমি জানি তুমি দেবে না। তুমি রোজ এক কথা বলো।'

মা দীর্ঘশ্বাসটা বুকে চেপে বাইরে তাকালেন, সামনে তাদের বিস্তীর্ণ ধানী জমি এখন পানিতে থৈ থৈ করছে। একসময় এই জমি থেকে কত ধান হতো খেয়ে ফেলেও শেষ করতে পারতেন না–এখন ছেলের মুখে ভাত তুলে দিতে পারেন না। কতদিন তারা ভাত খান না, ঢ্যাপ, শাপলার নাল, শালুক, হেলঞ্চা, কলমি শাক, কুচো চিংড়ি–এসব খেয়ে আছেন। সামনের এই জমিতে কি আর কখনো ধান হবে? যে পানি এসেছে সেটা তো বন্যার পানি নয় যে হঠাৎ এসেছে আবার হঠাৎ চলে যাবে। এই পানি জলাবদ্ধতার পানি, এই পানি এখানে থাকতে এসেছে, এক দিন দুই দিন নয়, এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ নয়, এক মাস দুই মাসও নয়–বছরের পর বছর।

মা তার পাঁচ বছরের টুকুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাবা আজ তুই কষ্ট করে খেয়ে নে, কাল তোকে ভাত দেব। তোর বাবাকে বলব শহর থেকে চাল আনতে।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'তাহলে আগে আমার পায়ের দড়িটা খুলে দাও, আমি কি ছাগল যে তুমি আমার পা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছ?'

মা হাসলেন। বললেন, 'ধুর বোকা। তুই ছাগল হবি কেন? তুই আমার সোনামণি টুকু। কিন্তু তুই যে এত ছটফটে, শুধু যে লাফঝাঁপ দিস কখন পানিতে পড়ে ভেসে যাবি তাই তো তোর পা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি।'

টুকু অনুনয় করে বলল, 'লাফঝাঁপ দেব না মা, আমি চুপ করে বসে থাকব, আমার পায়ের বাঁধনটা খুলে দাও।'

মা কোমরপানিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে দাঁড়িয়েই টুকুর পায়ের বাঁধন খুলে দিলেন। বারান্দায় হাঁটু-পানি, সেখানে একটা মাচা বাঁধা হয়েছে, টুকু সেই মাচার ওপর বসে আছে। বাসার ভেতরে, বাইরে, উঠানে, মাঠে, রাস্তায়–সব জায়গায় শুধু পানি আর পানি। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে। এই এলাকার বৃষ্টির সব পানি ঢল হয়ে এখানে নেমে এসেছে। দেখতে দেখতে পানি আরও বেড়ে গেছে। এখানে পানি আসে কিন্তু যায় না। কিছু অবিবেচক মানুষ স্লুইস গেট দিয়ে পানিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল, পলিমাটি দিয়ে নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে গেছে–এখন পানি ফিরে যাওয়ার রাস্তা নেই। এই বিপদটা মানুষ ডেকে এনেছে। মানুষের নিজের হাতে ডেকে আনা এর চেয়ে বড় বিপদ কি কেউ কখনো দেখেছে?

মা একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনে মাথা ঘুরে তাকালেন, তার বড় মেয়ে শিউলী স্কুল থেকে পানি ভেঙে হেঁটে আসছে। বই-খাতাগুলো মাথার ওপর ধরে রেখেছে যেন ভিজে না-যায়। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'স্কুল হলো?'

'হয়েছে মা।'

'তোদের স্কুলের মাস্টারদের নিশ্চয়ই মাথার ঠিক নেই, তা না-হলে চারিদিকে সব পানিতে ডুবে আছে তার মাঝে কেউ স্কুল করে?' মায়ের কথায় আসলে কোনো বিরক্তি নেই, স্কুলের মাথা-খারাপ মাস্টারদের জন্য এক ধরনের ভালোবাসা আছে। এই এলাকার সবাই লেখাপড়ায় খুব ভালো, পরপর দুবার শতভাগ সাক্ষরতার জন্য পুরস্কার পেয়েছে। আশপাশের সব গ্রামের সব স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে থেকে কালো পানিকে পাক খেয়ে যেতে দেখে। শুধু এই গ্রামের স্কুলটা এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। সবাই মিলে চালু রেখেছে, পানিতে হেঁটে, কাঠের ডোঙ্গায়, তালের ডোঙ্গায় আসে, পানিতে পা ডুবিয়ে বসে ক্লাস করে। কতদিন এভাবে চালিয়ে রাখতে পারবে কে জানে!

শিউলী তার বই-খাতাগুলো ঘরের ভেতরে উঁচু তাকে রাখে, এই বই-খাতগুলোই সম্বল, এগুলো যদি ভিজে নষ্ট হয়ে যায় তার সব শেষ হয়ে যাবে। বাইরে এসে সে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, বাবা কোথায়?'

'শহরে গেছে, আজকে মিটিং।'

'কার সঙ্গে মিটিং?'

'মন্ত্রীরা আসবে। ওয়াপদার ইঞ্জিনিয়ার আসবে। ডিসি-ম্যাজিস্ট্রেটরা আসবে, তাই এলাকার সবাই গেছে।'

'কিছু হবে মা?'

মা প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মা জানেন আসলে কিছু হবে না। একজন-দুজন নয়, এক হাজার-দুই হাজার নয়, চার লাখ মানুষ পানির মাঝে আটকা পড়ে আছে–কেউ তাদের দেখতে আসে না। শহরে বসে মিটিং করে চলে যায়। সবাই যখন চাপ দেয় তখন মাঝেমধ্যে কিছু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেয়, সেগুলো ভুলেও কাজে লাগায় না। আস্তে আস্তে সবাই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে–এই সমস্যাটার কথা বলে নানা রকম প্রজেক্ট তৈরি করা হয়, সেই প্রজেক্ট দেখিয়ে টাকা আনা হয়–তারপর সবাই মিলে টাকা লুটেপুটে খায়। যদি এই সমস্যাটা মিটে যায় তাহলে টাকা আসবে কোত্থেকে? আর টাকা যদি না আসে তাহলে লুটেপুটে খাবে কেমন করে। তাই সব মন্ত্রী-মিনিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার-আমলা মিলে সমস্যাটা বাঁচিয়ে রেখেছে–এটাকে দূর করছে না।

শিউলী বলল, 'ফুলি খালার ছেলেটার জ্বর বেড়েছে।'

'ডাক্তারের কাছে নিয়েছে?'

'না, কাঠের ডোঙ্গায় করে আজকে শহরের হাসপাতালে নেবে।' শিউলী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'শাহেদের হাতে-পায়ের ঘা আরও বেড়েছে। পেকে পুঁজ হয়ে গেছে।'
মা কিছু বললেন না, দিন-রাত পানিতে ভিজে থেকে তাদের সবারই হাতে-পায়ে ঘা হয়ে গেছে। এই ঘা কখনো কি কমবে?
শিউলী ভয়ে ভয়ে বলল, 'মা।'
'কী?'
'আমার ফরম ফিলাপের টাকা জোগাড় হয়েছে?'
মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মেয়েটা পড়ালেখায় ভালো, ক্লাস এইটে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল, এসএসসিতে নির্ঘাত জিপিএ ফাইভ পাবে। ফরম ফিলাপের সময় আসছে, একসঙ্গে অনেক টাকা লাগবে, কোথা থেকে আসবে এই টাকা? পুরো এলাকায় কারও কোনো রোজগার নেই, মাইলের পর মাইল যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি, আবাদ নেই, শস্য নেই, খাবার নেই। যার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে ফেলেছে–এখন বিক্রি করার মতোও কিছু নেই। এর মধ্যে কি কেউ লেখাপড়া করার কথা ভাবে? যারা একেবারে কুকুর-বেড়ালের মতো বেঁচে আছে, তারা কি লেখাপড়ার কথা ভাবতে পারে?
শিউলী মায়ের মুখ দেখে আর কিছু বলার সাহস পায় না। সে যদি ফরম ফিলাপ না-করতে পারে তাহলে কেমন করে পরীক্ষা দেবে? কত আশা করে আছে সে স্কুল-কলেজ শেষ করে মেডিকেলে পড়বে। পাস করে ডাক্তার হয়ে সে সাদা একটা অ্যাপ্রন পরে তার গ্রামে ফিরে আসবে, ছোট বাচ্চাগুলোর বুকে স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে বলবে, 'জোরে জোরে নিঃশ্বাস নাও।' তারপর কাগজে খস খস করে প্রেসক্রিপশন লিখে দেবে। এখন এই কালো পানি এসে তার সব স্বপ্নকে মিথ্যে করে দেবে? তাহলে সে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে?
মা ঘরের ভেতর থেকে কিছু ভেজা কাপড় এনে চিপে নেড়ে দিতে দিতে বললেন, 'শিউলী–মা, যা দেখি এক কলসি পানি নিয়ে আয়। স্কুলের টিউবওয়েলটা নাকি উঁচু করেছে।'
'যাচ্ছি মা।' শিউলী কলসিটা পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে ছপছপ করে হেঁটে যেতে থাকে। তার নিজেকে আর মানুষ মনে হয় না, মনে হয় একটা জলজ প্রাণী। মানুষ হলে কি আর কেউ দিন-রাত এ রকম পানিতে বেঁচে থাকতে পারে?
শিউলী পানি নিয়ে ফিরে এসে দেখে টুকু মাচাতে পা ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে আছে। শিউলী পানির কলসিটা ঘরের ভেতর চৌকির ওপরে রেখে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'টুকু, মা কোথায়?'
'মিনু খালার বাড়ি গেছে।'
'কেন?'
'মিনু খালার বাচ্চা হবে তো, তাই মাকে ডেকে নিয়েছে।' টুকু গম্ভীর গলায় বলল, 'ব্যথা উঠেছে।'
শিউলী একটা নিঃশ্বাস ফেলে, মিনু খালার বাড়ি খালের ওপারে। এখন তো খাল-বিল-পুকুর কিছুই আলাদা করে চেনা যায় না। পানিতে ডুবে সবই একাকার হয়ে গেছে। কয়দিন থেকে সবাই বলাবলি করছিল পূর্ণিমার রাতে নাকি মিনু খালার বাচ্চা হবে। তাকে তখন কখন কোথায় কীভাবে নেবে কিছুই বুঝতে পারছিল না, এখন দুই দিন আগেই মিনু খালার ব্যথা উঠেছে। এখন কী করবে? কোথায় নেবে? কেমন করে নেবে। শিউলী নিজের ভেতর কেমন জানি এক ধরনের অশান্তি অনুভব করতে থাকে।
টুকু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা শিউলী আপু, পানি যদি আরও বেশি হয় তখন কী হবে?'
'আর বেশি হবে না।'
'তুমি কেমন করে জান? যদি বাসার ছাদ পর্যন্ত পানি উঠে যায় তাহলে কি আমরা সবাই মরে যাব?'
'ধুর গাধা। মরবি কেন? কেউ মরবে না। দেশের সব মানুষ আমাদের কথা জেনে গেছে না? তারা সবাই আমাদের সাহায্য করতে চলে আসবে না?'
টুকু ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, 'কচু আসবে।'
মা যখন ফিরে এসেছেন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। উদ্বিগ্ন মুখে শিউলীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বাবা কি এসেছে?'
'না, মা।'
'দুশ্চিন্তার ব্যাপার হলো।'
শিউলী ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন মা? দুশ্চিন্তার ব্যাপার হলো কেন?'
'শহরের লোকজন নাকি মন্ত্রী-মিনিস্টারদের ঘেরাও দিচ্ছে। মন্ত্রী-মিনিস্টারদের সঙ্গে পুলিশ থাকে, বিডিআর থাকে, তারা তো কথায় কথায় গুলি করে দেয়।'
শিউলী চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'গুলি করেছে নাকি?'
'না। এখনো করেনি, কিন্তু করতে কতক্ষণ? যে অবস্থা চলছে আমার তো মনে হয় এক-দুই দিনের মাঝেই গুলিগোলা হবে।'
শিউলী প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'মা, মিনু খালার কী খবর?'
হঠাৎ মায়ের মুখটা হাসিতে ভরে গেল, হাসতে হাসতে বললেন, 'কী ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে, বিশ্বাস করবি না। একেবারে ফুলের মতোন।'
'কোনো অসুবিধা হয় নাই মা?'
'হয় নাই আবার! ডেলিভারি করার মতো একটা শুকনো জায়গা নাই। শেষে কোনো উপায় না-দেখে মিনুকে তুলেছি একটা কাঠের ডোঙ্গায়। আমরা কয়জন ডোঙ্গাটাকে শক্ত করে ধরেছি আর তখন সুহাসিনী দাই ডেলিভারি করাল। ডোঙ্গার ওপর জন্ম তো তাই সবাই হাসাহাসি করে বলছে, এই মেয়ের নাম দেওয়া হবে ডোঙ্গা বিবি!'

মায়ের কথা শুনে টুকু হি হি করে হাসতে থাকে।
বাবা এলেন একটু পরেই। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। মাচায় বসে শার্ট খুলে নিজেকে বাতাস করছিলেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে খেতে দেব? ঢ্যাপের খই আছে, সাথে হেলঞ্চের সেদ্ধ।'
বাবা মাথা নাড়লেন, বললেন, 'নাহ্‌! দুপুরবেলা শহরে এক কাপ চা খেয়েছিলাম, খিদে মরে গেছে।'
'শহরে মিটিংয়ের কী হলো?'
'কিছু হয় নাই। সবাই চাপ দিয়েছে এলাকাটাকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করতে। রাজি হয় না।'
'কেন রাজি হয় না?'
'জানি না। শুনেছি'–বাবা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।
'কী শুনেছ?'
'মন্ত্রী সাহেব নাকি বলেছেন, মালাউনের বাচ্চাদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে কোনো লাভ নেই।'
টুকু বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মালাউনের বাচ্চা মানে কী বাবা?'
বাবা হাত নেড়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা। ওসব কথা শুনতে হয় না।' টুকু তাই বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাল না, আদুরে গলায় বলল, 'বাবা, আমি কিন্তু কাল ভাত খাব।'
বাবা মাথা লাড়লেন। বললেন, 'ঠিক আছে।'
'আমি আর ঢ্যাপা খাব না। শাপলার নাল খাব না। শালুক খাব না। গরম ভাত খাব ডিম ভাজা দিয়ে।'
'ঠিক আছে বাবা।'
'আর আমি এই পানির ওপরে মাচায় বসে থাকব না। আমাকে তুমি শুকনো জায়গায় নিয়ে যাবে।'
'নিয়ে যাব।'
'শুকনো জায়গায় গিয়ে আমি লাফাব। আর দৌড়াব। তখন কি মজা হবে না বাবা?'
'হ্যাঁ, অনেক মজা হবে।'
টুকু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তুমি কবে শুকনো জায়গায় নিয়ে যাবে বাবা?'
'এই তো একটু সময় পেলেই নিয়ে যাব।'
টুকু ঠোঁট উল্টে বলল, 'তুমি কোনোদিন সময় পাবে না।'
বাবা বেশিক্ষণ বসলেন না, একটু পরেই আবার বের হয়ে গেলেন, গ্রামের লোকজন সন্ধ্যাবেলা আবার বসবে, এরপর কী করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করবে। কম বয়সী কিছু মাথা-গরম ছেলে আছে, তারা পারলে এখনই রাস্তাঘাট, ট্রেন সবকিছু অবরোধ করে জ্বালাও-পোড়াও শুরু করতে চায়। যে রকম অবস্থা তাদের বেশি দিন শান্ত রাখা যাবে না। বছরের পর বছর মানুষ পানিতে ডুবে থাকবে, কেউ তাদের জন্য কিছু করবে না–সেটা তো সহ্য করা যায় না।
সন্ধ্যাবেলা টুকু একা একা মাচার ওপর বসেছিল তার হাতে লাল রঙের একটা প্লাস্টিকের বল। বাবা যখন তাকে শুকনো জায়গায় নিয়ে যাবে তখন সে এই বলটা নিয়ে যাবে। শুকনো মাটির ওপর সে বলটা দিয়ে খেলবে। কেমন করে খেলবে সে সেটা একটু পরীক্ষা করে দেখল, ওপরে ছুড়ে দিয়ে ধরে ফেলল। হঠাৎ কী হলো, বলটা তার হাত থেকে ফসকে গেল, টুকু কাত হয়ে বলটাকে ধরতে গিয়ে মাচা থেকে নিচে পড়ে যায়। কোনোমতে মাচাটাকে সে ধরতে চেষ্টা করল, পারল না–চোখের পলকে সে পানিতে ডুবে গেল। কোনোমতে একবার সে মাথা বের করে চিৎকার করার চেষ্টা করল, কিন্তু কালো পানি তার মুখ দিয়ে ঢুকে গেল, হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে সে আবার পানির নিচে তলিয়ে গেল আর বের হলো না।
শহর থেকে একজন সাংবাদিক এসেছে, তাকে ঘিরে অনেক লোকজন বসেছে।। সাংবাদিকের বয়স বেশি নয়, চেহারায় একটা আন্তরিক ভাব। যে যেটাই বলছে সে তার ছোট নোট বইটাতে সেটা খসখস করে লিখে ফেলছে। বাবা কী একটা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন একজন লোক তার হাত খামচে ধরল। বাবা মাথা ঘুরিয়ে অবাক হয়ে দেখেন মাস্টার সাহেব। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মাস্টার সাহেব?'
'তুমি এক্ষুণি বাড়ি যাও।'
'কেন মাস্টার সাহেব?'
'তোমার ছেলে টুকু...'
বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কী হয়েছে টুকুর?'
মাস্টার সাহেব ফিস ফিস করে বললেন, 'মাচা থেকে পড়ে পানিতে ডুবে...'
বাবার মনে হলো তার মাথার মধ্যে বুঝি একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হলো। পড়ে যাচ্ছিলেন। কোনোমতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে ধরে নিজেকে সামলে নিলেন। তার মনে হতে লাগল, চোখের সামনে থেকে পুরো জগৎ-সংসার ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মনে হতে থাকে তার সামনে কোথাও কিছু নেই। শুধু বিশাল এক শূন্যতা, যে-শূন্যতার কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই।
কাঠের একটা ডোঙ্গায় টুকু নিথর হয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে একটা কুপিবাতি জ্বলছে। আগুনের শিখাটা নড়ছে, তার আবছা আলোতে টুকুর মুখের চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায় তাতে মনে হয় সে বুঝি খুব শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে।
মাওলানা সাহেব বললেন, 'আমার বাড়িতে একটা পরিষ্কার চাদর আছে। কেউ সেটা নিয়ে আসো, সেটা দিয়ে কাফন দেওয়া যাবে।'

মাস্টার সাহেব বললেন, 'কিন্তু মাটি দেব কোথায়? মাটি তো নাই।' মাওলানা সাহেব বললেন, 'অন্য দশজনের বেলায় যেটা করেছি সেটাই করব। নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেব। মাসুম বাচ্চা আল্লাহ নিজের কাছে নিয়ে নেবে।'

কেউ কোনো কথা বলল না। কাঠের ডোঙ্গাটা ঘিরে গ্রামের মানুষেরা কোমর পানিতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়ির ভেতর থেকে কান্নার একটা শব্দ ভেসে আসে, অন্ধকার রাতে সেই কান্নার শব্দ বুকের ভেতর এসে আঘাত করে।

মাওলানা সাহেব বললেন, 'আল্লাহ আমাদের মাপ করে দেবেন। মসজিদে পানি, নামাজ পড়তে পারি না। মন্দিরেও পানি হিন্দুরাও পূজা করতে পারে না। এই সময়টা হচ্ছে আজাবের সময়। এই সময়ে কোনো নিয়ম-কানুন নাই।'

মাস্টার সাহেব বললেন, 'তাহলে পানিতেই ভাসিয়ে দেব?'

'হ্যাঁ।'

বাবা অন্ধকারে এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন। এবার হঠাৎ এগিয়ে এসে কাঠের ডোঙ্গায় ঝুঁকে টুকুকে জড়িয়ে ধরলেন। ভাঙা গলায় বললেন, 'না। আমি আমার এই বুকের ধনকে পানিতে ভাসিয়ে দেব না। সে শুকনোর মাঝে খেলতে চেয়েছিল, আমি তারে শুকনোর মাঝে নিতে পারি নাই। আমি তারে শুকনোর মাঝে মাটি দিব।'

মাস্টার সাহেব বাবার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'তুমি শুকনো মাটি কোথায় পাবে? যেদিকে তাকাও, মাইলের পর মাইল খালি পানি।'

বাবা টুকুর শীতল দেহটি তুলে নিজের বুকের মাঝে চেপে ধরলেন, তারপর ফিস ফিস করে বললেন, 'আমি শুকনো মাটি খুঁজে বের করব। আমার টুকুর জন্য আমি মাটি খুঁজে বের করব।'

গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে দেখল একজন বাবা তার মৃত সন্তানকে বুকে চেপে ছপ ছপ করে পানিতে হেঁটে যাচ্ছে। সে এক টুকরো শুকনো মাটি খুঁজে বের করবেই। বেঁচে থাকতে যে শিশুটি শুকনো মাটি পায়নি, মৃত্যুর পর তাকে সে মাটিটুকু দেবেই।

****

এটি কাল্পনিক গল্প নয়, এটি সত্য গল্প। এখানে যে ঘটনাগুলোর কথা বলা হয়েছে যশোরের ভবদহে গিয়ে আমি সেগুলো নিজের চোখে দেখেছি, না-হয় নিজের কানে শুনেছি। একেবারে নিজের চোখে না-দেখলে কিংবা নিজের কানে না-শুনলে আমি সেটা বিশ্বাস করতাম না। চরিত্রগুলোর নাম বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনাটুকু কাল্পনিক হতে পারে কিন্তু মূল ঘটনাগুলোর সব সত্য। যশোরের ভবদহ এলাকার প্রায় চার লাখ পানিবন্দী মানুষের এটা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবন।

তাদের পাশে কেউ নেই। সরকার নেই, আমলা নেই, ওয়াপদা নেই, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক–কেউ নেই। যদি থাকত তাহলে এই মানুষগুলো বছরের পর বছর এই রকম একটা জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো না। খবরের কাগজে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলা হয় না। যখন বলা হয় তখন সেটি হয় এত দায়সারা যে সেই খবর কারও চোখে পড়ে না। তাই মানুষের তৈরি এত বড় বিপর্যয়ের কথা এই দেশের মানুষ জানে না। টেলিভিশনের জন্য সেটি খুব দুর্গম এলাকা, তাই তারা টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে সেখানে যায় না। টেলিভিশন চ্যানেল এখন তারকা খুঁজে বেড়াচ্ছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে তারকাদের ঝলমলে জীবন অনেক চমকপ্রদ। তাই পানিবন্দী দুঃখী চার লাখ মানুষের পাশে কেউ নেই।

কিন্তু তাদের পাশে মানুষকে দাঁড়াতে হবে। এই দেশের মানুষকে এখনই তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল: লেখক। অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, শাবিপ্রবি।